International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-II, September 2016, Page No. 17-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

অসমের ক্ষেত্রী অঞ্চলের কার্বি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান : সমীক্ষানির্ভর পর্যবেক্ষণ

রাজেশ খান
এম. ফিল ছাত্র, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The Karbi and Bodo are the important ethnic groups in North-East India and who hold rich and unique traditional knowledge. They are the true ethnic tribal community. In Assam, surrounding area of Khetri of Dimoria block of the district of Kamrup (Metro), a large number of Karbi and Bodo people live there. They are involved in many types of cultural expressions, agricultural, indigenous medicinal thought etc. which are related to traditional knowledge and this generally has been passed on from generation to generation. Traditional knowledge generally refers to traditional knowledge systems embedded in the cultural traditions of regional, indigenous, ethnic groups or local communities. It includes different types of knowledge about traditional technologies of subsistence (e.g. tools and techniques for hunting or agriculture), folk medicines, traditional preservation techniques of different materials and ecological knowledge etc. The Karbi and Bodo are preserving their own traditional knowledge in terms of daily life practices. It is used among those ethnic people as a part of their culture and it is most significant and important aspect of Bodo and Karbi people. In this paper, we have documented the traditional knowledge and discussed on different types of traditional techniques among the Bodo and Karbi people of Khetri are.

Key Words: Karbi, Bodo, Traditional Knowledge, Folk Medicine, Preservation.

১. ভূমিকা : উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী জনজাতিদের মধ্যে কার্বি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভাবৈশ্বর্যময়। ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের অন্যতম রাজ্য হল অসম। এই রাজ্যে অন্যান্য জনজাতির পাশাপাশি কার্বি ও বোড়ো জনজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। কার্বি ও বোড়ো—এই দুই জনজাতির অন্তর্গত মানুষেরা তাদের ভাবৈশ্বর্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ধারাকে বংশপরম্পরায় বহন করে চলেছে। ঐতিহ্যগত ধারার একটি সজীব শাখা হল ঐতিহ্যময় জ্ঞান বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান বা *Traditional Knowledge*। অসমের ডিমোরিয়া ব্লকের অন্তর্গত ক্ষেত্রী অঞ্চলের কার্বি ও বোড়ো জনজাতির ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতির বহুমুখী চলনকে তুলে ধরা সম্ভব। এর মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের কথা। ক্ষেত্রী এলাকার কার্বি ও বোড়ো জনজাতিসমূহ খাদ্য প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে, পানীয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ,

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকার, কৃষিকাজ — বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ধারাকে লালন-পালন করছে। কার্বি এবং বোড়ো জনজাতির দৈনিক জীবনাভ্যাসকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ, তাদের মধ্যে প্রচলিত উল্লিখিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানকে এ নিবন্ধে বহুকৌণিক দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. ক্ষেত্রী অঞ্চলের কার্বি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : অসমের আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থানমূলক বসতি স্থাপনের ফলে। ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতি উপজাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর অসমিয়া জাতির বর্তমান রূপ পরিলক্ষিত হয়। আর এই রূপ পরিগ্রহ করেই সংগঠিত অসমিয়া জাতিসত্তা। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে চা চাষ প্রসারের জন্য বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ বিভিন্ন স্থান থেকে নানাবিধ উপজাতি সম্প্রদায়কে চা-শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে তাঁতি, মুণ্ডা, কুর্মি, কোল, খেরিয়া, সাওরা, সবর, ওরাওঁ, কার্বি, তিওয়া এবং সাঁওতাল— এইসব জনজাতিগোষ্ঠী অসমিয়া সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে অসমিয়া সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় কার্বি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়। তেজাল টেরনের মতে কার্বি জনজাতি মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর চিনা-তিব্বতি শাখার অন্তর্গত। এদের ভাষা তিব্বতী-বর্মী ভাষা বংশজাত।[১] অন্য দিকে বোড়ো জনজাতি, উত্ত-পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যের অন্যতম জনজাতি, প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসিন্দা। অসমের সামগ্রিক জনজাতির (Tribe) নিরিখে প্রায় চল্লিশ শতাংশ বোড়ো জনজাতি। জনসংখ্যার নিরিখে বোড়ো জনজাতির পরেই কার্বিদের অবস্থান।

অসমের কামরূপ (মহানগর) জেলার ডিমোরিয়া ব্লকের এবং ক্ষেত্রী এলাকা অধিনস্ত শান্তিপুর, বড়ধুলিয়া এবং তেতেলিগুড়ি গ্রামে আমরা সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন করি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি। এখানে দু'টি জনজাতির অন্তর্ভূক্ত মানুষের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন- বোড়ো এবং কার্বি। শান্তিপুর গ্রামে প্রায় ১৫০ ঘর বোড়ো জনজাতির বসবাস। গ্রামটি ডিমোরিয়া উন্নয়ন পরিষদের টোপাতলী (৬৩ নং) পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত। অন্য দিকে তেতেলিগুড়ি কার্বি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা। এখানে প্রায় ৮০-৯০ ঘর কার্বি পরিবার বসবাস করে। কার্বি মহিলারা তাঁত বোনায় বিশেষ পারদর্শী। বড়ঢুলিয়া গ্রামে ঢুলিদের বসতি বেশি। এরা কার্বি জনজাতির অর্ন্তভুক্ত। সমীক্ষাক্ষেত্রে গিয়ে কার্বি এবং বোড়ো জনজাতিদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বহুকৌণিক দিক থেকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. অনুসৃত তত্ত্ব ও পদ্ধতি : অসমের কামরূপ জেলার ডিমোরিয়া ব্লকের ক্ষেত্রীর পার্শবর্তী এলাকায় ৩ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৯ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত সমীক্ষাকার্য সম্পন্ন করি। উদ্দিষ্ট জনজাতি (Target Group) হিসাবে আমারা সামনে রেখেছিলাম কার্বি, তিওয়া এবং বোড়ো জনজাতিদের। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং প্রয়োজন মাফিক কেস স্টাডির সাহায্য নিয়েছি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা সরাসরি সংগঠিতভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি। আর সাক্ষাৎকার নেবার সময় সংগঠিত এবং অসংগঠিত দু'ধরনেরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারকালীন প্রশ্ন করা হয়েছিল বদ্ধপ্রান্ত এবং মুক্তপ্রান্ত দু'ধরনের প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের এই সমীক্ষা দু'ভাবে সংগঠিত করা হয়। যেমন— জনজাতির ঘরে ঘরে গিয়ে, যেখান থেকে আমরা জনজাতির ধারাবাহিক প্রবাহিত জীবনধারাকে চাক্ষুস দেখতে পেয়েছি, যাকে আমরা বলতে পারি 'Actual setting of daily life'। আর তাদের যে অভিকরণমূলক শিল্প আছে, সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য উক্ত পরিবেশে, আরোপিত অবস্থা সৃষ্টি করে তাদের শিল্প সুষমাকে প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এই বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকায়ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য নেবার জন্য উদ্দেশ্যমুখীনভাবে তাদের কাছেই গিয়েছি, যারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত।

৪. ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান (Traditional Knowledge) : কার্বি ও বোড়ো জনজাতিগণ বংশপরম্পরাগতভাবে দেশীয় জ্ঞানের রক্ষক। জনজাতিদ্বয়ের দৈনিক জীবনাভ্যাসকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এরা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন— খাদ্য প্রস্তুতিকরণ, পানীয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদি— বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনজাতি সমূহ ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানকে অবলম্বন করে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। যেমন —

১. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রণালী
২. গৃহনির্মাণ শৈলী
৩. ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিকার পদ্ধতি
৪. কৃষিকাজ সম্পৃক্ত ঐতিহ্যজ্ঞান
৫. পরম্পরাগত লোকচিকিৎসা প্রণালী ও লোকঔষধ ইত্যাদি।

৪.১. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রণালী : খাদ্য, পানীয় জল, খাদ্যশস্য, জ্বালানী ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে উপজাতি সমূহ ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এই সংক্রান্ত সমীক্ষাপ্রাপ্ত যে উপাদান পাওয়া গিয়েছে তাকে এভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

১. খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
২. পানীয়-জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
৩. জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
৪. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৪.১.১. খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : খাদ্যবস্তু ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার রীতি বহু প্রাচীন কালের। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তার অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু জনজাতিরা এখনও সনাতন পদ্ধতি বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের (Traditional Knowledge) ওপর নির্ভর করে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। যেমন— মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পাটপাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সুপারি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৪.১.১.১. মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : খাদ্য সংরক্ষণের এক প্রাচীন পদ্ধতি হল খাদ্য রোদে শুকানো। মাছও রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। মাছকে রোদে রাখা হয় জল অপসারণের জন্য। মাছের দেহে যে জল বর্তমান থাকে তা মাছ পঁচনে সহায়তা করে। খোলা জায়গায় বাতাস এবং রোদ ব্যবহার করে মাছকে শুকানোর প্রথা অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বোড়ো ও কার্বি জনজাতিরাও তাই করে। মাছের দেহের জলের পরিমাণ কমে গেলে ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবসমূহ জন্মাতে বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। ফলে মাছ ভালো থাকে।

প্রথমে মাছকে ভালো করে ধুয়ে লবণ জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে জল ঝরানোর জন্য বাঁশের তৈরি চাটাই বা চালুনি বা মাদুরের ওপর মাছগুলো বিছিয়ে সূর্যালোকে শুকানো হয়। বোড়ো ভাষায় চালুনিকে বলা হয় 'সাংন্দ্রী'। প্রখর রোদে দু'তিন দিনের মধ্যে তা শুকিয়ে যায়। এমনটা করা হয় ছোটো মাছের ক্ষেত্রে। বড়ো মাছের ক্ষেত্রে নাড়ি-ভুড়ি ও আঁশসহ দ্রুত পচনশীল অংশ বের করে ফেলে দিয়ে ভালো করে ধোঁয়া হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে মাছগুলোকে চেরা হয়। এরপর পূর্বের মতো জল ঝরিয়ে খোলা আকাশের নিচে চাটাই বা চালুনি বা মাদুরের ওপর মাছগুলোকে শুকানো হয়। শুকনো মাছ পলিথিনের ব্যাগে বা প্লাস্টিক বাক্সে সংরক্ষণ করা হয় *(চিত্র নং- ১ ও ২)*। এমনটা করা হয় মূলত বোড়ো জনজাতির ক্ষেত্রে। [২]

চিত্র নং ১ - মাছ সংরক্ষণ করে রাখার পাত্র হাতে বোড়ো রমণী রোহিণী বোড়ো

চিত্র নং ২ - পলিথিনের প্যাকেটে সংরক্ষিত মাছ

চিত্র নং ৩ - মাছ সংরক্ষিত রাখার পাত্র 'পাব'

কার্বিরাও অনেকটা ঐ একইভাবে সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ জলশূন্য করে। কিন্তু রোদে শোকানোর পর শুকনো মাছের মধ্যে একধরনের ক্ষার ও নুন মেশায়। এই ক্ষার তারা তৈরি করে কলাগাছের গোড়ার অংশ থেকে। কলাগাছের গোড়ার অংশ রোদে শুকিয়ে তা আগুনে পোড়ানো হয়। আগুনে পোড়ালে তা কালো ধরনের গুড়ো উপাদান তৈরি হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'ছাঁয়' বলে। এরপর ঐ ছাঁয়কে নারকেলের 'মালোয়' অর্থাৎ নারকেলের অন্তঃভাগে যে শক্ত অংশ থাকে তার মধ্যে রেখে তাতে জল দেওয়া হয়। পরিণত নারকেল ছাড়ালে এই শক্ত মালোয় পাওয়া যায়। মালোয়ের নিচে একটা ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে জল গড়িয়ে নিচে রাখা পাত্রে জমা হয়। ঐ জমাকৃত উপাদান হচ্ছে ক্ষার। ক্ষার আর নুন জল মাখিয়ে মাছকে একদিন রোদে রেখে দেওয়া হয়। মাছগুলি নরম (কার্বি ভাষা- কুমল) হলে তা বাঁশের মধ্যে রাখা হয়। এটাকে তাদের ভাষায় বলে 'বাঁশের পাব'। এটা তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশের দুই গিরি বা গাটের মধ্যবর্তী অংশ কেটে নিয়ে, তার একদিক খোলা রাখা হয়; আর একদিক বাঁশের গিরি দ্বারা বন্ধ থাকে। যে মুখ খোলা থাকে সেদিক দিয়ে ঐ মাছগুলি শক্ত কাঠি দ্বারা *ঠেসে ঠেসে* বা টিপে টিপে 'বাঁশের পাবে' প্রবেশ করানো হয় *(চিত্র নং- ৩)*। পাবের সামনের দিকে কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখা হয়। ছায়ের মণ্ড দিয়ে ঐ ফাকা অংশ পূর্ণ করা হয়। উল্লেখ্য কলাগাছের গোড়ার অংশ পুড়িয়ে যে ছায় প্রস্তুত করা হয়েছিল, তার সাথে জল মিশিয়ে ছায়ের মণ্ড তৈরি করা হয়। তবে ঐ মণ্ড বাঁশের পাবের ফাকা অংশে দেওয়ার আগে মাছের ওপরে কলা পাতা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ঐ ছায় মাছের সাথে মিশে যেতে না পারে। এভাবে সংরক্ষিত মাছ তিন থেকে চার বছর যাবৎ রেখে দেওয়া যায় এবং প্রয়োজন মতো তা খাওয়া হয়। কার্বি ভাষায় এই ধরনের মাছকে 'হিদল' বা 'তমাল' বলে। [৩]

৪.১.১.২. পাট পাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : কার্বি জনজাতির একটা বিশেষ খাদ্য পাটপাতা। এরা পাটপাতাকে শুকিয়ে রেখে বিভিন্ন তরি-তরকারির সঙ্গে খায়। সাধারণত পাটপাতা কাঁচা অবস্থায় রসালো থাকে। যখন এটা সংগ্রহ করা হয়, তখন তা কাঁচা থাকে। ক্ষেত থেকে টাটকা তরতাজা পুষ্ট বা কচি পাতা সংগ্রহ করা হয়। বেশিরভাগ পাতা পোকায় কেটে বা পোকা লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কেবল মাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পোকায় কাটা নয় এমন পাতাগুলিই চয়ন করা হয়।

পাতা রসালো হবার কারণে তাতে জল থাকে। সে কারণে পাতায় দ্রুত পচন ধরে। তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাতাগুলি ক্ষেত থেকে আনা মাত্র আবার জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তা যখন জলশূন্য হয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে যায়, তখন তা বিভিন্ন পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শুকনো পাতা পলিথিন প্যাকেট বা প্লাস্টিক পাত্রে রাখা হয় *(চিত্র নং- ৪)*। এই ধরনের পাত্রে হাওয়া বা বায়ু প্রবেশ করতে পারেনা। হাওয়া বা বায়ু পাট পাতাকে খুব তাড়াতাড়ি নরম করে দেয়। তাতে তা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো পাট পাতাকে এভাবে রেখে দেওয়া যায়। শুকনো পাতাকে বলা হয় 'মরা পাতা'। পরে যখন এই পাতা খাবার ইচ্ছা হয়, তখন তা গরম জলে ভিজিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। এককথায় শোধন করা হয়। তারপর তা তরকারিতে দেওয়া হয়। মূলত ডাল, মাছে এই পাতা বেশি ব্যবহার করা হয়। পাট পাতা দিয়ে যে তরকারি প্রস্তুত করা হয় তাকে বলা হয় 'মরাপাতার অঞ্জা'। [৪-৫]

চিত্র নং ৪ - পলিথিন প্যাকেটে সংরক্ষিত পাট পাতা

৪.১.১.৩. সুপারি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : কার্বিদের সুপারি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিটি অসাধারণ। সুপারি গাছ থেকে পরিপক্ক সুপারি সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেই সুপারির গায়ে যে চামড়া বা খোসা থাকে তা ছাড়ানো হয়। এরপর তা রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। এই সমগ্র পদ্ধতিটি কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমে গাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় পরিপক্ক সুপারিকে সংগ্রহ করা হয়। সুপারি পাড়ার সময় লম্বা জাতীয় বাঁশ ব্যবহার করা হয়। তা দিয়েই সুপারি পাড়া হয়। এছাড়া সুপারি পেকে হলুদ হয়ে গেলে একা একাই পড়ে যায়। এই সুপারিগুলি একস্থানে গচ্ছিত রাখা হয়। সংগ্রহীত বা গচ্ছিত সুপারিকে দা দিয়ে মাঝ বরাবর কেটে দু'টুকরো করা হয়। ঐ টুকরো টুকরো সুপারির খোসা ছাড়িয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয় *(চিত্র নং- ৫ ও ৬)*। আবার কখনো কখনো সংগ্রহীত বা গচ্ছিত সুপারিকে না

চিত্র নং ৫ - কার্বি রমণী রম্ভা তেরন দা দিয়ে সুপারী ছাড়াচ্ছে

চিত্র নং ৬ - রোদে সুপারি শোকানোর কৌশল

চিত্র নং ৭ - কার্বি জনজাতির সুপারি রাখার পাত্র

কেটেই রোদে কয়েক দিন শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর খোসা বা খোলস ছাড়ানো হয়। কার্বি ভাষায় এই খোসাকে 'বাকল' বলে। ভালো মতো রোদ থাকলে দু'চার দিনেই সুপারি শুকিয়ে যায়। যতদিন না ভালোভাবে সুপারি শোকায় অর্থাৎ সুপারির মধ্যে যে জল বা রসালো ভাব আছে তা পুরোপুরি জলশূন্য না হয়, ততোদিন তা রোদ রাখা হয়। শুকিয়ে গেলে তা খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই শুকনো অবস্থায় সংরক্ষণ করে রাখা সুপারিকে কার্বি ভাষায় 'মিঠা তাম্বুল' বলা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কার্বিরা সুপারিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখে। [৬]

৪.১.১.৪. খাদ্যশস্য ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : পাহাড়ে মূলত ঝুমচাষ পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বোড়ো ও কার্বি জনজাতিরা ধানকে দু'ভাবে সংরক্ষণ করে। এক – খাদ্যশস্য ধানের সংরক্ষণ এবং অন্যটি হলো বীজ ধানের সংরক্ষণ। দু'টোর পদ্ধতিই পৃথক। আমরা এখানে কেবল খাদ্য শস্য ধান সংগ্রহ করে রাখার নিয়ম আলোচনা করবো। কার্বি ও বোড়ো উভই জাতিগোষ্ঠীই ক্ষেত থেকে পাকা ধান সংগ্রহ করার পর সেই ধানকে ঝাড়াই করে। তারপর ধানের মধ্যে যে চিটিধান থাকে বা আবর্জনা থাকে তা তারা পরিষ্কার করে। এরপর ঐ ধান ৩-৪ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে কয়েকদিন ঠান্ডা স্থানে রাখে। পরে আবার ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে উপযুক্ত পাত্রে ও যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করে। পাত্র হিসাবে ব্যাবহার করা হয় 'ডুলি'*(চিত্র নং- ৮)*। এই ডুলি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। ডুলির গায়ে গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। কেউ কেউ আবার বাঁশের চাটাই দিয়ে চারকোনা ধরণের 'গোলা ঘর' তৈরি করে নেয়। এই গোলা ঘরের গায়েও গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটির পাত্র, বস্তা, পলিথিনসহ বস্তা, ডোল বা ডুলি ইত্যাদিতে ধান রাখা হয়। বোড়োরা ধান ভাঙ্গানোর আগে ধান সেদ্ধ করে না। এরা কেবল রোদে শুকিয়ে নিয়ে ধান ভাঙ্গায়। এদের প্রধান ফসল ধান। এই একই পদ্ধতিতে গম শস্যও সংগ্রহ করে রাখে। [৭-৯]

চিত্র নং ৮ - ডুলিতে সংরক্ষিত খাদ্য শস্য ধান

৪.১.১.৫. অন্যান্য : বোড়ো সমাজ সিজু গাছকে আরাধনা করে। তাঁরা বিশ্বাস করেন এটি পৃথিবীর আদি গাছ। তাই এই আদিগাছকে তাঁরা আদিদেবতা হিসাবে মান্যতা দেয়। আরাধ্য দেবতা হিসাবে মান্যতা দেবার কারণে এই গাছ তারা কাটে না। সেই জন্য এই সমাজে সিজু গাছ বংশপরাম্পরায় সংরক্ষিত হয়ে আসছে। [১০]

৪.১.২. পানীয়-জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : কার্বি ও বোড়োরা সনাতন পদ্ধতিতে জল পরিশুদ্ধ করে পান করে। আমরা সমীক্ষায় এক অভিনব জল শোধনের পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছি। উভই জনজাতির লোকেরা নদী-নালা, পুকুর জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে। কেউ কেউ আবার কুয়োর জল পান করে *(চিত্র নং- ৯)*। কার্বিরা পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে জল সংগ্রহ করে।

চিত্র নং ৯ - পানীয়-জল সংরক্ষিত রাখার কুয়ো

চিত্র নং ১০ - পানীয়-জল পরিশোধনের লৌকিক পদ্ধতি

এলাকায় সরকারী নলকূপের প্রচলন রয়েছে। সেখান থেকেও জল সংগ্রহ করা হয়। তবে সব জলই পরিশোধন করেই তারা পান করে। তাদের মতে, এলাকায় আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি। সে কারণে তারা জল পরিশোধন না

করে পান করে না। বোড়োরা জল পরিশোধনের জন্য লৌকিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। প্রথমে কল বা জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে কলসি বা টিনে রাখা হয়। ঐ কলসি বা টিনকে একটা উচু স্থানে রাখা হয়। উচু স্থান হিসাবে মূলত বাঁশের তৈরি মাচা ব্যবহার করা হয়। ঐ কলসি বা টিনের নিচে একটা ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে নিচে পড়ে। পরিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করার জন্য নিচে আর একটি পাত্র রাখা হয়। ঐ পাত্রে জমাকৃত জলই পান করা হয়।

কল বা জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে কলসি বা টিনে রাখা হয়। ঐ কলসি বা টিনের ভিতরে জল পরিশোধনের জন্য কয়েক স্তরে বালি, নেট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর থাকে। ঐ লেয়ার বা স্তর পেরিয়েই জল পরিশুদ্ধ হয়ে নিচে রাখা পাত্রে চুইয়ে চুইয়ে জমা হয় *(চিত্র নং- ১০)*। ঐ জমাকৃত জল পানের জন্য অন্য পাত্রে রাখা হয় এবং সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বোড়ো জনজাতির মানুষেরা এভাবেই পানীয়-জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। [১১]

অন্যদিকে কার্বিরা পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে পাইপলাইন সংযোগে বাড়িতে জল নিয়ে আসে এবং সেই জল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে রাখে। যাদের কুয়ো আছে তারা কুয়োর জল পান করে। [১২]

৪.১.৩. জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : ক্ষেত্রী অঞ্চলটি পাহাড় সংলগ্ন। এখানে বনভূমির প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের কার্বি এবং বোড়ো জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত পাহাড়ী বনভূমি থেকে তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী সংগ্রহ করে থাকেন। যারা পাহাড় থেকে সংগ্রহ করতে অপারগ, তারা অন্যদের কাছ থেকে বা বাজার থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করেন। পাহাড় থেকে আনা গাছের ডাল বা গুড়িকে সুন্দরভাবে কেটে রৌদ্রে শুকোতে দেয়। জল বা রস নিষ্কাশন হলে সেগুলি গুছিয়ে আঁটি বেধে ঘরে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। কখনো কখনো বাঁশের মাচার ওপর বা রান্নাঘরে জ্বালানী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে *(চিত্র নং- ১১)*। এভাবেই বোড়োরা জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।[১৩]

চিত্র নং ১১ - বোড়ো জনজাতির রান্না ঘরে সংরক্ষিত জ্বালানী

কার্বিরা কাঠ ছাড়াও উলু-খেড় জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। কার্বি ভাষায় উলু-খেড়কে 'ফালাং' বলা হয়। তবে 'ফালাং' দিয়ে ঘরের ছাউনিও প্রস্তুত করা হয়। ঘরের ছাউনি মানে ঘরের চালাকে বোঝায়। জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত গাছের ডালকে কার্বি ভাষায় 'ঠেং' বলে। জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত গাছের ডাল এবং বাঁশ সংরক্ষণ করে মাচার ওপর রাখা হয়। মাচাটি বাঁশ দ্বারা নির্মিত। মাচাকে এদের ভাষায় বলা হয় 'হোং' এবং অসমী ভাষায় 'ছ্যাং'। [১৪]

৪.১.৪. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রণালী : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদনকে, বোড়ো জনজাতির অন্তর্ভূক্ত মানুষেরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখে। বোড়ো জনজাতির রান্নার আনাজ-পাতি রান্না ঘরে সংগ্রহ করে রাখার পদ্ধতি সত্যিই অভিনব। তবে গ্রামীণ বাঙালির রান্না ঘরেও এমনটা লক্ষ্য করা যায়। বোড়োরা রান্নার আনাজ-পাতি কিভাবে রান্না ঘরে সংগ্রহ করে রাখে আমরা কেবল সে দিকেই আলোকপাত করবো।

বাজার থেকে আনা বা নিজেদের চাষ করা সব্জিপাতি বা আনাজপাতি ঘরের এক কোনায় বা মাচায় রাখা থাকে। মাচা সাধারণত বাঁশ এবং কাঠের দ্বারা নির্মিত হয়। মাচার কয়েকটি ধাপ লক্ষ্য করা যায় *(চিত্র নং- ১২)*। তাঁদের বিশ্বাস এই মাচায় আনাজ দ্রব্য রাখলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। নিচে অর্থাৎ মাটিতে যে আনাজপাতি রাখা

হয়, সেগুলি রাখার আগে মাটিতে বস্তা বা পলিথিন জাতীয় কিছু পেতে রাখা হয়। কারণ মাটির রসের সংস্পর্শে আনাজ-দ্রব্য বেশিদিন থাকে না। নষ্ট হয়ে যায়।

চিত্র নং ১২ - বোড়ো জনজাতির রান্নার আনাজ-পাতি রান্না ঘরে সংগ্রহ করে রাখার কৌশল

চিত্র নং ১৩ - বোড়ো জনজাতির লঙ্কা সংগ্রহ করে রাখার পাত্র 'তুকরি'

লঙ্কা এবং পেয়াজ রাখা হয় বাঁশের তৈরি একধরনের ঝুড়িতে। কার্বি ভাষায় একে 'তুকরি' বা 'ডুখলি' বলে *(চিত্র নং- ১৩)*। এছাড়া বড়ো বড়ো বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয় সব্জিপাতি রাখার জন্য। [১৫-১৬]

৪.২. গৃহনির্মাণ শৈলী : প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কার্বি এবং বোড়ো জনজাতি প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করা গাঁছ, বাঁশ, শনকে তাদের গৃহ নির্মাণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। বাড়িগুলো মাটি থেকে ৯ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু খুঁটি দিয়ে তৈরি করা হয়। খুটি বাঁশ এবং গাছের হয়ে থাকে। কার্বি ভাষায় ঘরকে 'ঘর'ই বলে। যেমন রান্না ঘরকে বলে 'পাক ঘর' *(চিত্র নং- ১৪)*। বোড়োদের তৈরি করা ঘর গুলো দেখতে পরিপাটি এবং বেশ সুন্দর। কার্বিদের গৃহনির্মাণ শৈলী দেখতে বেশ নয়নাভিরাম। ঘরগুলিতে অসংখ্য বাঁশ ও গাছের খুঁটি দিয়ে শক্ত-মজবুত করে তোলা হয়। ঝড় ও হাওয়ায় যাতে ভেঙ্গে না যায়। ঘরের আকার মোটামুটি বড় মাপের হয়ে থাকে। এঁরা ঘর নির্মাণের জন্য একটির সাথে অন্য একটির নৈকট্য বজায় রাখে। এটি সামাজিক প্রীতিবন্ধনের অংশ মনে করে। [১৭]

চিত্র নং ১৪ - কার্বি জনজাতির রান্না ঘর

চিত্র নং ১৫ - বোড়োদের বাড়ির চারিদিক বাঁশের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা

বোড়ো জনজাতির গৃহে অসাধারণ বাঁশের কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙালিদের মতোই এদের পূর্বমুখী ঘর করার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে ঘরে টিনের ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ইটের তৈরি পাকা ঘরও অমিল নয়। বাড়িতে বিভিন্ন দিকে নানারকম ঘর তৈরি করতে দেখা যায়। যেমন গোয়াল ঘর সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাখা হয়। বাড়ির চারিদিক বাঁশের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াতে বেশ কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়*(চিত্র নং- ১৫)*।

কার্বি জনজাতির গৃহেও বাঁশের কাজের আধিক্য বেশি। আসলে ঐ অঞ্চলে বাঁশের প্রতুলতা রয়েছে। সে কারণেই বাঁশ ব্যবহারের আধিক্য। গৃহের ওপরের অংশ অর্থাৎ চালা হয় খড়ের তৈরি। আমরা মূলত কার্বিদের ঐতিহ্যবাহী ঘরের কথা বলছি। বোড়োদের মতো তাদের গৃহ নির্মাণেও আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িতে দু-একটা ঐতিহ্যবাহী গৃহ রয়েছে। এঁরা ঘরের বেড়া তৈরি করে বাঁশের চাটাই দিয়ে। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর মাটি ও গোবরের প্রলেপ দেয় *(চিত্র নং- ১৪)*। এতে বেড়া পাকাপোক্ত বা দৃঢ় হয়। টেকসই হয় বেশি। মাটির উচ্চতা থেকে ঘরের ভীত এক থেকে দেড় ফুট উচুতে থাকে। কার্বিরাও ঘর নির্মাণের জন্য একটির সাথে অন্য একটির নৈকট্য বজায় রাখে। এদের ঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- রান্নাঘর (পাক ঘর) ও ঠাকুর ঘর সবসময় বাড়ির পূর্ব দিকে থাকবে। ঠাকুর ঘরকে কার্বি ভাষায় 'মুনিকুর' বলা হয়। শয়ন ঘর সর্বদা পশ্চিম মুখী রাখা হয়। দিক নির্দেশিকা অনুযায়ী ঘর করার প্রথা সংসারের জন্য মঙ্গলকর বলে তারা বিশ্বাস করে। বাড়ির সৌন্দর্য আরোও বাড়িয়ে দেয় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে থাকা একটা করে কুয়ো। [১৮]

৪.৩. ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিকার পদ্ধতি : জীবনধারণের জন্য মানব সমাজকে কখনো কখনো শিকার করতে হয়। অনেকের আবার শিকার করা একটা নেশা, আভিজাত্য ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আমরা এখানে তাদের কথা বলছি না। আমরা বলছি তাদের কথা, যারা দু'বেলা রুজি রোজগারের জন্য, খাদ্য অন্বেষনের জন্য শিকার করে। কেউ মাছ শিকার করে, কেউ বা হরিণ শিকার। এরা নিজস্ব বা সোনাতন পদ্ধতিতে শিকার করে। জনজাতিদের মধ্যে বন্যপশু-পাখি, হরিণ, মাছ ইত্যাদি শিকার করার প্রচলন রয়েছে। আমাদের আলোচনা কেবল মৎস শিকার পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বোড়ো ও কার্বি জনজাতির নারী-পুরুষ উভয়েই মাছ শিকারে অংশগ্রহণ করে। বোড়োরা মাছকে বলে 'না'। সাধারণত নদী-নালা, খাল-বিল,খাড়ি থেকে এরা মাছ সংগ্রহ করে। মাছ সংগ্রহের সময় এরা 'জাকৈ' বা 'জাখৈ', 'খোলই', 'ডিংগুরি' ব্যবহার করে। বোড়ো ভাষায় এদের ঐ নামে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হলো মাছ ধরার সরঞ্জাম। কার্বি ভাষায় 'ডিংগুরি' কে 'ডিংগুড়ি' বলা হয়। মাছ সংগ্রহের সময় কার্বিরাও জাল বা নেট, জাকৈ বা জাখৈ, খোলই ব্যবহার করে। কার্বি ও বোড়ো দু'ই জনজাতির লোকজন মাছ ধরার সময় হাত দিয়েও মাছ ধরে *(চিত্র নং- ১৬)*। [১৯]

চিত্র নং ১৬ - মৎস শিকাররত বোড়ো জনজাতির মানুষেরা

৪.৪. কৃষিকাজ সম্পৃক্ত ঐতিহ্যজ্ঞান : কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে জনজাতিদের মধ্যে নানাবিধ ঐতিহ্যময় জ্ঞানের প্রচলন রয়েছে। ধানের বীজ কিভাবে সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রাখা হয়— কেবলমাত্র এই সংক্রান্ত তথ্যাদির ওপর আমদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.৪.১. ধান বীজ সংরক্ষণের কৌশল : যে ধানের বীজ রাখবে সেই ধানকে বোড়োরা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখে। ফসল কাটার পর সেই ধানকে ৩-৪ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে কয়েকদিন ঠান্ডা স্থানে রাখে। এরা যে ধানকে বীজ হিসাবে রাখে তা খুব ভালো এবং পরিপুষ্ট হয়। কারণ আগে থেকেই এঁরা কোন ধানের বীজ রাখবে তা চিহ্নিত করে রাখে। আবার কখনো কখনো ধান ঝাড়াই করার পর ভালো পুষ্ট ধানকে বীজের জন্য আলাদা করে রাখে। খারাপ বা অপুষ্ট ধান বাছাই করে ঝেড়ে ফেলা হয়। বীজ ধানকে এরা 'আইজং' বলে। প্রথমবার শোকানোর পর পুনরায় ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ স্থানে রাখা হয়। এরপর ঐ বীজ শস্য উপযুক্ত পাত্রে ও

যথাস্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। এখন প্রশ্ন ঐ বীজ কিভাবে সংরক্ষিত থাকে? আমরা এবার সে বিষয়ে আলকপাত করবো। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, কার্বি আর বোড়োদের বীজ সংরক্ষণ প্রণালী কিন্তু এক নয়, পৃথক।

সঠিকভাবে বীজ না শুকালে বীজতলায় বীজ অংকুরোদগমে সমস্যা হতে পারে। তাই বোড়োরা এই দিকে বেশ ভালোভাবে নজর রাখে। বীজ ধান বা 'আইজং' প্রথমবার শোকানোর পর আবার পুনরায় ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে, ঘরের মেঝেতে রেখে ঠান্ডা করে নেয়। এরপর উপযুক্ত পাত্রে ধান রেখে তা যথাস্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। মূলত চটের বস্তা বা পলিপ্যাকে বীজ রাখা হয়। তারপর তা গোলাঘর বা ঘরের এককোণে, মাটি থেকে উচুঁতে রাখা হয়। এভাবে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে ঐ বীজকে রক্ষা করা যায়। ঐ পাত্রের মধ্যে যদি বায়ু চলাচল করে, তবে ঐ বীজ পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তারা পাত্রের মুখ খুব ভালো করে আটকে দেয়।[২০]

চিত্র নং ১৭ - কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষিত রাখার পাত্র

চিত্র নং ১৮ - কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষিত রাখার কৌশল

কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষণ প্রণালী একেবারে দেশীয় পদ্ধতির জ্বলন্ত উদাহরণ। বীজ ধান নির্বাচন বোড়োদের মতই। এরপর নির্বাচিত ধানকে খুব ভালোভাবে রোদে শোকানো হয়। ধান মাপার জন্য একটা ছোট্ট ঝুড়ি ব্যবহার করে। এই ঝুড়ি বাঁশের দ্বারা নির্মিত। কার্বি ভাষায় একে বলা হয় 'হ'। এই 'হ' দিয়ে পরিমাণ মতো ধান মেপে, সেই ধানের বীজ পাত্রে রাখা হয়। যতটা ধান বীজ হিসাবে রাখা হবে, তা খড়ের তৈরি 'শকআঠক' এ রাখা হয়। এই 'শকআঠক' হলো ধানের খড় দ্বারা নির্মিত *(চিত্র নং- ১৭ ও ১৮)*। কেবলমাত্র বীজ ধানই এতে রাখা হয়।

'শকআঠক' সৃজনেরও একটা লৌকিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে গাছের ছাল দিয়ে 'শকআঠক'-এর খাপাচি বা কাঠামো বানানো হয়। এই খাপাচিকে কার্বি ভাষায় 'খিংহিরি' বলে। এই 'খিংহিরি'র মধ্যে ডালি বোনানোর মতো করে ছয় থেকে আটটি বাঁশের তৈরি 'চটা' রাখা হয়। তার ওপর খড় সাজিয়ে দেওয়া হয়। এর মাঝে ধান রাখলে সেই ধানসহ খড় 'খিংহিরি'র মধ্যে প্রবেশ করে যায়। আর ঐ 'চটা'গুলির মুখ ওপরে উঠে আসে। এবার 'চটা'দিয়ে খড়সহ সুন্দরভাবে বেধে ফেলা হয়। বাঁশের তৈরি 'চটা'কে কার্বি ভাষায় 'জিংটা' বলা হয়। বাধার সময় 'খিংহিরি' কিছুটা উপরে তুলে নেওয়া হয়। আগামী মরসুমের ধান চাষের জন্য এভাবেই 'শকআঠক'-এর মধ্যে ধান সংরক্ষণ করে রাখা হয়। বীজধানের পরিমাণ অনুযায়ী 'শকআঠক'-এর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। বীজের পরিমাণ বাড়লে 'শকআঠক' সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। [২১]

৪.৪. পরম্পরাগত লোকচিকিৎসা প্রণালী ও লোকঔষধ : মানুষের জীবনে রোগ-ভোগ একটা সহজাত ঘটনা। কার্বি এবং বোড়ো জনজাতির মানুষেরা দৈনন্দিন জীবনের এই ধরনের সমস্যা মেটাতে, নিজস্ব ঐতিহ্যগত জ্ঞানকেই কাজে লাগায়। সাধারণভাবে চিকিৎসা-সংক্রান্ত ওষুধ প্রস্তুতের জন্য সনাতন পন্থায়, পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে, যে সকল লোকায়ত কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা লোকচিকিৎসা প্রণালী বলতে পারি। এই প্রণালীতে ব্যবহৃত প্রতিষেধক বা ঔষধকে আমরা লোকঔষধ বলতে পারি। কার্বি এবং বোড়ো জনজাতি দৈনন্দিন

জীবনের নানান সমস্যার জন্য লোকচিকিৎসা প্রণালী এবং লোকঔষধের আশ্রয় নেয়। আমরা এই অংশে কার্বি এবং বোড়ো জনজাতির লোকঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

৪.৪.১. জ্বর-সর্দি-কাশি হলে ব্যবহৃত লোকঔষধ : জ্বর হলে বোড়োরা 'অরহল' গাছের পাতা বেটে কপালে লাগায়। 'অরহল' হলো এক ধরনের ডাল জাতীয় শস্য। এছাড়া নাজনে পাতা জলে 'চুবিয়ে' কপালে লাগালে জ্বর থেকে উপশম পায়। সর্দি-কাশি হলে বোড়োরা সর্ষের তেলের সাথে রসুন মিশিয়ে গরম করে বুকে লাগায়। এছাড়া বোড়োদের আরাধ্য পৃথিবীর আদিগাছ সিজু গাছের পাতা কলাপাতার মধ্যে মুড়ে 'কুমল' আগুনে 'সেঁকা' হয়। এই পাতা কিছুটা 'সেঁকা' বা সেদ্ধ হলে তা থেকে রস বের করে মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশি থেকে উপশম পাওয়া যায়। কাশি হলে কার্বিরা মধুর সাথে তুলসি পাতা মিশিয়ে খায়। [২২]

৪.৪.২. আঘাত লাগলে (মচকে গেলে, হাড় ভাঙলে) : হাড় ভেঙ্গে গেলে 'হাড় জোড়া' গাছের পাতা ভালো করে বেটে নিয়ে ভাঙ্গা স্থানে সযত্নে কাপড় বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে বেধে দেওয়া হয়। এতে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে বলে বোড়োদের বিশ্বাস। আর কার্বিরা হাড় ভেঙ্গে গেলে 'লপ্লুংপ্লে' গাছের পাতার মিশ্রণ লাগিয়ে তার ওপর বাঁশের বাতা বেধে রাখে*(চিত্র নং- ১৯)*। আর পা মচকে গেলে বোড়োরা ঐ স্থানে 'রইসন বেরা'র পাতা বেটে লাগায়। তাছাড়া ঝাড়-ফুঁক করারও চল রয়েছে বোড়ো সমাজে। হাতে পায়ে ব্যাথা-বেদনা হলে কার্বিরা 'সাংপুম' গাছের পাতাতে সর্ষের তেল লাগিয়ে গরম করে মালিস করে। এমনটা করলে ব্যাথা নিরাময় হয়। শরীরের ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি না সারলে কার্বিরা গোসাপের চামড়া রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে ক্ষত স্থানে লাগায়। এতে ক্ষত স্থান তাড়াতাড়ি সেরে যায়। [২৩-২৪]

চিত্র নং ১৯ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত 'লপ্লুংপ্লে' গাছ

চিত্র নং ২০ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত জারমানি

চিত্র নং ২১ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত কাশিদুরিয়া গাছ

৪.৪.৩. কেটে গেলে : হাত-পা বা শরীরের কোন স্থানে কেটে গেলে বোড়োরা কাটা স্থানে 'জারমানি' *(চিত্র নং- ২০)* 'তেজপাতা', 'বিলোই পাতা' বেটে লাগায়। লাগালে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর কার্বিরা কাটা স্থানে বাঁশের গায়ে লেগে থাকা সাদা আবরণ তুলে ঐ স্থানে লাগায়। এতে করে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। [২৫]

৪.৪.৪. ব্যাথা হলে : দাঁত ব্যাথা হলে বোড়োরা পেয়ারার কচি পাতা ব্যাথা স্থলে দু-তিন দিন দিয়ে রাখে। এতে ব্যাথা কমে যায়। কলাগাছের শিকড় পুড়িয়ে এক ধরণের ছায় প্রস্তুত করা হয়। সেই ছায় দাঁতের গোঁড়ায় লাগিয়েও দাঁতের ব্যাথা কমানো হয়। তাছাড়া তারা কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে।
মাথা ব্যাথা হলে অ্যালোবেরা (শালকোয়ারি)-র পাতার রস কপালে লাগালে মাথা ব্যাথার উপশম হয়। টনসিলে ব্যাথা হলে টগর গাছের ছাল (মির হেরেল) চিবিয়ে খেলে সেরে যায়। এছাড়া কার্বিরা গা-হাত-পায়ে ব্যাথা বেদনা হলে কাসিদুরিয়া গাছের পাতা বেটে লাগায় *(চিত্র নং- ২১)*। [২৬-২৭]

৪.৪.৫. জণ্ডিস হলে : জণ্ডিস হলে ' রিপেসস্বাস' নামক এক ধরনের লতানো গাছের সাথে কাঁকড় মিশিয়ে খেলে জণ্ডিস সেরে যায়। এটা ১০-১৫ দিন অন্তর খেতে হয়। [২৮]

সুতরাং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসার লৌকিক প্রণালীর ব্যবহারিক উপযোগিতা আজও অনস্বীকার্য। আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর সমান্তরালে, লৌকিক প্রণালীজাত চিকিৎসা পরিসেবা, জনবৃত্তীয় সমাজে ব্যপকভাবে না হলেও তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। লৌকিক চিকিৎসা প্রণালী আজও ভরসা যুগিয়ে চলছে। আত্মবিশ্বাস উদ্দীপনে (Self Confidence Level) লোকচিকিৎসাবিদ্যা ব্যপকভাবে সফল। যেখানে তথাকথিত আধুনিকতার আলোকচ্ছটা তেমনভাবে অধিকার স্থাপন করেনি, মূলত সেসব জায়গায় প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে এই ধরনের চিকিৎসা জনজাতির মানুষেরা আত্মবিশ্বাস উদ্দীপন বাড়াতে ব্যপকভাবে কাজ করে।

৫. কার্বি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের সঙ্কট ও সম্ভাবনার নানা দিক : আধুনিক প্রযুক্তবিদ্যা প্রসূত সমাজ সংস্পর্শ, আধুনিক এবং সনাতন জীবনধারার মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দেয়। সম্ভোগলিপ্সু জনগণসহ যাঁরা সাধারণ সম্ভোগী তাঁরাও আজ আধুনিকতার পূজারী। সমাজ-সংস্কৃতি আজ অসহায়, আক্রান্ত। দেশজ ভাবনাজাত চিন্তন-জগত আজ বিব্রত এবং ক্রুদ্ধ, যার কারণে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে জটিলতা এবং সঙ্কট। সম্ভোগলিপ্সু হন আর নিসম্ভোগী মানুষ হন, প্রত্যেকেরই সমাজের কাছে একটা প্রত্যাশা আছে। সেই প্রত্যাশাজাত চাহিদা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তা বর্তমান সমস্যার সৃজন করছে। আসলে এই সমস্যা সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্কটময় দ্যোতক নাকি তার বিবর্তন, এই বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়— সমাজ তার সাবেকি রূপ হারিয়ে নবরূপ ধারণ করেছে, যার নির্যাসে আর যা কিছু থাক, দেশজ ভাবনা ও চিন্তন পরিসর আজ অনেক কম। কার্বি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানও আজ এই সংস্পর্শ থেকে দূরে নয়। আমরা এই প্রেক্ষিতে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো।

৫.১. সঙ্কটের নানা দিক : মূলত সমাজের মোড়লগণ বা প্রবীণ সমাজ ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের সম্প্রসারক। তাঁদের অনুপস্থিতি সমাজে বড়ো ধরনের সমস্যা সৃজন করতে পারে। তাই সকলের এই বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। এই দায়বদ্ধতা যেমন সংশ্লিষ্ট সমাজের নবীন ও প্রবীণ উভয়েরই, তেমনি লোকসংস্কৃতির গবেষকগণও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নির্বাহ করতে পারে। আমরা এই প্রেক্ষিতে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। লোকসংস্কৃতির গবেষকগণের এই বিষয়সমূহের দিকে আরোও বেশি করে নজর দেবার অবকাশ রয়েছে। আসলে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ এক্ষেত্রে সমাজ সেবকের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ আমরা লোকসংস্কৃতির গবেষকদের Social Activist Folklorist-র ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি। বেশি বেশি করে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা-লিখি, প্রচার করে জনজাতির আত্মজ গরিমা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির পরিকাঠামোর সঙ্গে ঐতিহ্য এমনভাবে সম্পৃক্ত যে এদের মধ্যে যেকোনো একটা কিছুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐতিহ্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং তা ধারাবাহিকভাবেই চলছে। স্বাভাবিকভাবে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। কেও কেও আবার এই পরিবর্তনকে পরিবর্তন না বলে রূপান্তর বলার পক্ষ্যপাতি। পরিবর্তন বা রূপান্তর যাই বলি না কেনো এর যেমন ভালো দিক আছে, তেমন উল্টোটাও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্য-গরিমা ধরে না রাখার পশ্চাতে রয়েছে নানাবিধ কারণ। একদিকে যেমন রয়েছে প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে আজকাল নবীনদের মধ্যে স্ব-সংস্কৃতির প্রতি একটা অবহেলা ভাব পরিলক্ষিত। সমীক্ষিত অঞ্চলে গিয়ে দেখি চিকিৎসার যে লৌকিক প্রণালী তা কেবল গ্রামের প্রবীণদের মধ্যেই প্রবাহমান। যুবক-যুবতীদের এই বিষয়গুলির প্রতি তেমনভাবে সমাদর লক্ষ্য করা যায় না। তাঁরা অনেক বেশি আধুনিক পন্থী। প্রাচীনত্ব বা সেকালের ভাবনা তাঁদের বাস্তব জীবনাচারণের পক্ষ্যে পরিপন্থী। কখনো কখনো নবীনরাও দেশজ ভাবনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাও আবার আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অপ্রতুলতার সূত্রে।

প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব যেকোনো স্থানের যেকোনো সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সমাজ-মনোস্তত্ত্বগত কিছু কারণ রয়েছে। সমাজ-মনোস্তত্ত্বর পাশাপাশি সম্ভোগলিপ্সু জীবনাচরণে যখন আধুনিকতার হাল্কা প্রলেপ পড়ে এবং তা যখন যুব সমাজ গ্রহণ করে, তখন তাদের সাথে প্রবীণদের মানসিক দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায়। নবীন-প্রবীণের মনন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের প্রতিবেশ খুব কম গড়ে ওঠে। ফলে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের স্থানান্তর খুব কম হয়। এই বিষয়টি অন্যান্য সমাজের মতো অসমের কার্বি ও বোড়ো জনজাতির মধ্যেও বিশেষ মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানবীজ প্রতিস্থাপনের সুযোগ খুব কম হচ্ছে এবং সেই প্রতিবেশও গড়ে উঠছে না। ফলে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের বিস্তার স্থান অনেকটায় কমে যাচ্ছে। অনেক সময় প্রকৃতিগত কারণও প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। সরকারী-বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, সম্মান ও কদর যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

৫.২. সম্ভাবনার নানা দিক : অসমের কার্বি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের সজীবতা রয়েছে— তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আনন্দের বিষয় হল— এই জনসমাজ এখনো পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনাচারণে দেশজ ভাবনা সম্পৃক্ত জীবনাচর্যাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানই তাঁদের একমাত্র ভরসা। অসমের জনজাতিসমূহ দৈনন্দিন জীবনাচারণে প্রায় প্রত্যেক মুহূর্তে স্বজাতিগত নিজস্বতাকে তুলে ধরে। এই ব্যবহারের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি বৈচিত্র্য রয়েছে স্বজাতিগত নিজস্বতার। অসমের ক্ষেত্রী এলাকার কার্বি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে, পানীয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকারকালীন, কৃষিকাজে ব্যবহৃত— ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক ও সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এঁরা নিজেই প্রস্তুত করে। নবীন প্রজন্মের একটা অনীহা কাজ করলেও তা কিন্তু এখনো প্রখর মাত্রা পায়নি। সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট জনজাতি ঐতিহ্য-গরিমা ধরে রাখার পক্ষ্যেই সওয়াল করে। ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক ও সামাজিক উপযোগিতার দিকে তাকিয়ে আমাদের তেমনটায় মনে হয়েছে। এতে করে জনজাতিদ্বয়ের আর একটি দিক উঠে এসেছে— তা হল দেশজ জীবন-যাপনের তাগিদ। লোকসংস্কৃতির প্রাণ-প্রবাহমানতা এখনও সচল— এই তাগিদ তারই স্বাক্ষ্যবাহী। এঁরা অতি মাত্রায় দেশজ জীবন-যাপনের পক্ষ্যে। যার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ভাঙন রোধ হচ্ছে। জনজাতির নিজস্ব ভাবনাজাত অভিজ্ঞতা প্রতিস্থাপনের প্রতিবেশ গড়ে তুলতে পারলে আরোও ভালো হয়।

৬. কার্বি ও বোড়ো জনজীবনে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক গুরুত্ব : জনজাতির দৈনন্দিন জীবনাচরণ, মনন তথা সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক জীবনাচারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে চিরায়ত এই লোকঐতিহ্যজাত জ্ঞান। বিভিন্ন জনজাতি ও জনসাধারণের মতো কার্বি ও বোড়ো জনজীবনেও সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কারগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এই সংস্কারসমূহের মধ্যেও সজীব রয়েছে নানাবিধ ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান, যার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা পালন একদিকে যেমন ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের সজীবতাকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছে, তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে এবং করছে। ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতের নিয়মে ছেড়ে দিয়েও বলা যায় ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও উত্তরাধিকার সূত্রেই তা বিভিন্ন সময়ে অত্যধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। 'শিকড়' অন্বেষণে - কখনও ব্যক্তিক উদ্যোগে, পূর্বপুরুষ ইতিবৃত্তায়নে, স্মৃতিচারণায়, কখনও সামাজিক টানে আবার কখনো বা সহজ প্রতুলতায় ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আজও অবিচল রেখেছে। ফলে আজও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যপকভাবে দৃশ্যমান।

ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করে উত্তরাধিকারজাত জাতীয়তাবাদী চেতনা। এলাকার প্রবীণ, প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব, পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে যে প্রতিবেশ গড়ে ওঠে, সেই সমাজের

সংস্পর্শে সন্তান-সন্ততিদের মানিসিক পরিকাঠামো জগত গড়ে ওঠে। তখন ঐ যুবসমাজ উত্তরাধিকারজাত দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। উত্তরাধিকার ভাবনাজাত অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়। তারাও সেই ধারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এঁরা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান-ভাবনা ব্যবহারে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। অনেক বেশি একাত্ম অনুভব করে। এভাবেও গরিমাময় দেশজজ্ঞান অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধান সাধন করে।

কার্বি ও বোড়ো জনজাতির মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনবিরল অঞ্চলে বসবাস করে। অনেক সময় তথাকথিত আধুনিক সমাজের সংস্পর্শ পায় না। যে কারণে তাঁরা লোকায়ত জ্ঞান সম্পৃক্ত বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবন-যাপনে অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা লোকায়ত উপাদান অনেক বেশি সহজলভ্য। হাতের কাছে সর্বদা পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে বলা যায়, সনাতন জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়ার ফলে জনজাতির টাকা-পয়সা অনেক বেশি সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ সমাজ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় দেশজ জ্ঞানের অবস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে অনেক সময় সামাজিক দায়বদ্ধতাগত অনুভূতি ক্রিয়া করে। তার ফলে জনবৃত্তের মধ্যে স্বজাত ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা অনেকেই মনে করেন এসমস্ত কিছু তাদের একান্তভাবেই নিজের এবং তা রক্ষার দায়-দায়িত্ব স্বাভিমানের পরিচায়ক।

নানাবিধ ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞান কেবলমাত্র লৌকিক বা সংস্কারসমূহের সমাহার নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্ত্বার অবস্থান দেখা যায়। আধুনিকতার অতলস্পর্শী আবেদনকে অস্বীকার করেও যে আজ স্বমহিমায় জাজ্বল্যমান, তা আর যাইহোক কেবলমাত্র সংস্কার বা অবৈজ্ঞানিক সত্ত্বার ওপর নির্ভর করে সজীব থাকতে পারে না। এর মধ্যে অবশ্যয় যুক্তি ও বিজ্ঞান রয়েছে, যে সত্ত্বার ওপর নির্ভর করেই সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধান সাধিত হয়। যে কারণে আজও সমাজ লোকজজ্ঞানের গুরুত্বকে মহিমান্বিত করে রেখেছে। বিভিন্ন জনসমাজ, দৈনন্দিন জীবনাচারনে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে আসছে।

৭. উপসংহার : একটা সময় সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বায়নের পিছনে ধাওয়া করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার শুরু হয়েছে শিকড়ে ফেরার। তবে দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে। বিশ্বায়নকে সঙ্গে রেখে নিজেকে জানার আকাঙ্ক্ষা পুনরায় মানুষকে শিকড়ের সন্ধানে ফিরিয়েছে। একটা সময় প্রযুক্তি ছাড়াই সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখন কিন্তু সময় ও ভাবধারা দু'ই পাল্টেছে। এখন প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বায়ন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অনেকের অভিমত বিশ্বায়নের প্রভাবে সংস্কৃতি আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। ত্রিস্তরীয় (পরিশীলিত, লোক এবং আদিবাসী) সমাজ ব্যবস্থায় প্রথম দু'টি স্তর মোটামুটি ভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত। অপেক্ষাকৃত জনজাতি সমাজ (Tribal Society) কম প্রভাবিত। এঁরা সনাতন ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে ছিল, আজও অনেকাংশে তা ধরে রাখতে সচেষ্ট। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অপেক্ষা লোকায়ত জ্ঞান ব্যবহার করতেই এঁরা বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন। তাছাড়া এই জনজাতিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনবিরল অঞ্চলে বসবাস করায়, অনেক সময় আধুনিক প্রযুক্তবিদ্যা প্রসূত সমাজ সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। ফলে তাঁরা লোকায়ত জ্ঞান সম্পৃক্ত বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবযাপনে নির্ভরশীল। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণিত - অন্যান্য জনসাধারণ অপেক্ষা জনজাতিরা (Tribe) ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবন-যাপনে বেশি অভ্যস্থ। দেশজ জীবন-যাপনের আলাদা তাগিদ লক্ষ্য করা যায় তাঁদের মধ্যে। ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবন-যাপন যেন এঁদের শোণিত ধারায় সম্পৃক্ত। আমাদের আলোচনার বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে বলা যায়— বিভিন্ন লোকভিকরণশিল্প প্রদর্শন, উৎসবাদি, বুনন শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও স্বাভিমানের স্পর্শ রয়েছে। অনেক সময় জনজাতিরা কেবলমাত্র ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল জীবন-যাপন করে। কৃষিকাজ কেন্দ্রিক, বিভিন্ন জিনিসপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পরাম্পরাগত জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রামের প্রবীণদেরকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের অনুপস্থিতে ভাবৈশ্বর্যময় এই দেশজজ্ঞান অবলুপ্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। সংশ্লিষ্ট সমাজের যুবকরা এখন অনেক বেশি আধুনিক। এঁদের চাল-চলন, জীবন ধারায় এসেছে অনেক বেশি পরিবর্তন। তাঁরা বেশিরভাগ সময় নিজস্ব ভাব,

ঐতিহ্য-গরিমা ধরে রাখতে সচেষ্ট নয়। এ বিষয়ে যুবসমাজের আরোও বেশি সচেতন হবার দরকার। প্রয়োজনে এলাকার প্রবীণ সমাজ আলাদা প্রতিবেশ গড়ে, যুবসমাজকে দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে আগ্রহী করে তুলতে পারেন। নিজস্ব ভাবনাজাত অভিজ্ঞতাকে তাঁদের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে গরিমাময় দেশজজ্ঞানকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১. টেরন, তেজাল, অলিখিত কার্বি ইতিহাস অন্বেষণ, কারবি আংলাং জিলা সাহিত্য সভা, ডিফু, ২০১০, পৃ. ১৫ (মুদ্রিত)
২. তথ্যদাতা : রোহিণী বোড়ো, বয়স-৩৯, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
৩. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
৪. তথ্যদাতা : মঞ্জুলাতুমুঙ, বয়স-৩২, গ্রাম- তেতেলি গুড়ি, পোঃ গান্ধীনগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
৫. তথ্যদাতা : পুর্নিমা বনজাং, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
৬. তথ্যদাতা : রম্ভা তেরন, বয়স- ৫৫, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
৭. তথ্যদাতা : ভারতী দেওমারী, বয়স - ৪৫, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
৮. তথ্যদাতা : শেওয়ালি বোরো, বয়স - ৩২, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
৯. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
১০. তথ্যদাতা : দত্ত বোরো, বয়স - ৪০, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
১১. তথ্যদাতা : কবিতা দেওমারী, বয়স-৩৫, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
১২. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
১৩. তথ্যদাতা : তুতু মনি বসুমাতারি, বয়স-৩৭, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
১৪. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬
১৫. তথ্যদাতা : তুতু মনি বসুমাতারি, বয়স-৩৭, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬
১৬. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

১৭. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

১৮. তথ্যদাতা : হরগৌরি রামসারি, বয়স-৫১, গ্রাম- শান্তিপুর , পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬

১৯. তথ্যদাতা : হরগৌরি রামসারি, বয়স-৫১, গ্রাম- শান্তিপুর , পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬

২০ তথ্যদাতা : ধীরেন রায়, বয়স-৪৫, গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ- টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৫.০৪.১৬

২১. তথ্যদাতা : করণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২২. তথ্যদাতা : রম্ভা তেরন, বয়স- ৫৫, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৩. তথ্যদাতা : লুইত রোহাং, বয়স-৭১, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৪. তথ্যদাতা : ফুলেশ্বরী কাথার, বয়স-৬০, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৫. তথ্যদাতা : লুইত রোহাং, বয়স-৭১, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৬. তথ্যদাতা : লুইত রোহাং, বয়স-৭১, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৭. তথ্যদাতা : ফুলেশ্বরী কাথার, বয়স-৬০, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬

২৮. তথ্যদাতা : লুইত রোহাং, বয়স-৭১, গ্রাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগর, থানা- ক্ষেত্রী, কামরূপ মহানগর, অসম, তারিখ - ০৬.০৪.১৬